হরির হোটেল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

(ছোটগল্প)

স্টেশনে ট্রেন থামতে-না-থামতেই যাত্রীদের মধ্যে হুলস্থুল বেধে গিয়েছিল। ভিড়ে ঠাসা কামরা।

পিছন থেকে প্রচণ্ড চাপ আর তো টের পাচ্ছিলুম। তারপর দেখলুম, কেউ-কেউ আমার কাঁধের ওপর দিয়ে কসরত দেখিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে চ্যাঁচামেচি চলেছে। অবশেষে ঠেলা খেতে-খেতে যখন প্ল্যাটফর্মে পড়লুম, তখন আমার ওপর দিয়ে অসংখ্য জুতো-পরা পা ছুটে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, অন্য সব কামরা থেকেও পিলপিল করে মানুষ বেরিয়ে স্টেশনের গেটের দিকে ছুটে চলেছে।

রাগ করে লাভ নেই। কার ওপরই বা রাগ করব! নিমেষে প্ল্যাটফর্ম নির্জন নিঝুম হয়ে গেল। কাঁধের ব্যাগ আর পোশাক ঝেড়েঝুড়ে রুমালে মুখ মুছলুম। ট্রেনটা হুইসল বাজিয়ে আস্তেসুস্থে চলে গেল। সেই সময় হঠাৎ মাথায় এল, ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছিল সম্ভবত। তাই অত সব যাত্রী প্রাণভয়ে ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল!

এতক্ষণে ভয় পেলুম। রাত আটটা বাজে। প্ল্যাটফর্মে আর স্টেশনঘরে আলো জ্বলছে। গেটে মানুষজন নেই। সেখানে গিয়ে একটু দাঁড়ালুম। ডাকাতরা ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনঘরে ঢুকে হামলা করেছে কি না দেখবার জন্য উঁকি মারলুম।

নাঃ। স্টেশনঘরে উর্দিপরা এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছেন। তাকে বললুম,–একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?

তিনি চোখ না খুলেই বললেন,–পারেন। তবে আপনার বরাতে হরির হোটেল আছে।

অবাক হয়ে বললুম, হরির হোটেল মানে?

–হুঁ। এ তল্লাটে নতুন এসেছেন। যাবেন কোথায়?

–কাঞ্চনপুর।

–সেখানে কার বাড়ি যাবেন?

একটু বিরক্ত হয়ে বললুম,–সেখানে আমার বন্ধুর বাড়ি।

রেলকোট পরা ভদ্রলোক এবার চোখ খুলে একটু হেসে বললেন, আপনার বন্ধু আপনাকে এখানকার হালহদিশ কিছুই জানাননি দেখছি। তা কী আর করবেন? হরির হোটেল এখন আপনার ভবিতব্য।

কথা না বাড়িয়ে বললুম,–গেটে টিকিট নেওয়ার লোক নেই। টিকিটটা নেবেন কি?

–টিকিট কেটেছেন? তা এ তল্লাটে নতুন প্যাসেঞ্জার। টিকিট কাটবেন বইকী। ইচ্ছে হলে দিন। না হলে দেবেন না।

বুঝলুম, এই ভদ্রলোকই স্টেশনমাস্টার। মাথায় হয়তো ছিট আছে। টিকিটটা ওঁর সামনে টেবিলে রেখে বললুম,–আচ্ছা, এবার বলুন তো, অতসব যাত্রী ট্রেন থেকে ওভাবে মরিয়া হয়ে নেমে দৌড়ে পালাল কেন?

–আজ যে শনিবার। তাতে ট্রেন চার ঘণ্টা লেট।

–বুঝলুম না।

–বুঝতে পারবেন। গেট পেরিয়ে নিচের চত্বরে যান।

গেট পেরিয়ে গিয়ে দেখি, কয়েক ধাপ সিঁড়ির নিচে একটা খোলামেলা জায়গা। একপ্রান্তে কিছু দোকানপাট। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় লক্ষ করলুম, চত্বর একেবারে জনহীন। আমার সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মল বলেছিল, স্টেশন থেকে নামলেই বাস, সাইকেলরিকশা বা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি একটা কিছু পেয়ে যাব। কিন্তু কোথায় তারা?

একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছিল। সেখানে গিয়ে বেঞ্চে বসে বললুম, পরের বাস কটায় দাদা?

চা-ওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, বাবুমশাইয়ের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

–কলকাতা।

–ঠিক, ঠিক। তা যাওয়া হবে কোথায়?

–কাঞ্চনপুর। পরের বাস কখন আসবে?

–বাবুমশাই! এ রাত্তিরে আর বাস আসবে না। আসবে সেই ভোরবেলা। কেননা রাত্তিরে তো এই স্টেশনে আর কোনও ট্রেন থামে না।

–সাইকেলরিকশো বা একাগাড়ি?

চা-ওয়ালা হাসল। আজ্ঞে না। খামোকা কেন রাত্তিরবেলা ওরা আসবে? বাবুমশাই! আপনি বড় ভুল করেছেন। আসবার সময় দেখেননি সোনাগড় জংশনে হঠাৎ ট্রেনের কামরায় বেজায় ভিড় হয়েছিল?

মনে পড়ে গেল। বললুম,–তুমি ঠিক বলেছ। কামরা একেবারে ফাঁকা ছিল। হঠাৎ ওই জংশনে ভিড়ের চাপে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলুম।

–ব্যাপারটা হল, এ তল্লাটের অসংখ্য লোক সোনাগড়ে কলকারখানায় চাকরি করে। তারা প্রতি শনিবারে বাড়ি ফেরে। রোববারটা কাটিয়ে আবার সোমবার সোনাগড় যায়। আপনি যদি ট্রেন থেকে

নেমেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে আসতেন, তা হলে হয়তো বাসে বা সাইকেলরিকশো, নয়তো এক্কাগাড়িতে ঢুকে যেতে পারতেন। হ্যাঁ–সহজে পারতেন না। একটু কসরত করতে হতো, এই যা!

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। নির্মলের ওপর রাগ হল। এই ব্যাপারটা আমাকে তার খুলে বলা উচিত ছিল।

কিন্তু আর রাগ করে লাভ নেই। তাছাড়া নির্মলের মেয়ের অন্নপ্রাশন কাল রবিবার। আমি কবে যাব, নির্দিষ্ট করে তাকে তো বলিনি! শুধু বলেছিলুম,–নিশ্চয় যাব। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করিস।

বললুম,–এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না দাদা?

চা-ওয়ালা গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল, না বাবুমশাই! উনুনে আমার রাতের রান্না শেষ করে জল ঢেলে দিয়েছি। আর চা করার কোনও উপায় নেই।

–আচ্ছা, এখানে হরির হোটেলটা কোথায়?

লোকটা যেন চমকে উঠল-হরির হোটেল। এর আগে কখনও হরির হোটেলে খেয়েছিলেন নাকি?

–না। আমি এই প্রথম এখানে আসছি। হরির হোটলের কথা স্টেশনমাস্টারের মুখে শুনলুম।

–ও। হরির হোটেলে যখন যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে, চলে যান। তবে একটু দেখেশুনে যাবেন।

বলে চা-ওয়ালা আমার মুখের সামনেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিল। এখানে দেখছি সবই অদ্ভুত। লোকজনও অদ্ভুত! হরির হোটেলে যেতে দেখেশুনে যাব কেন? কিছু বোঝা গেল না।

এতক্ষণে চাঁদ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সব দোকানপাট বন্ধ। শুধু শেষদিকটায় আলো জ্বলছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম, একটা ঘর খোলা আছে। দরজার কাছে টেবিলের সামনে একজন রোগাটে গড়নের কালো রঙের লোক বসে আছে। পরনে ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়া। ভেতরে দুসারি লম্বা বেঞ্চের সঙ্গে উঁচু ডেস্ক আঁটা। দেখেই বোঝা যায় এটা একটা হোটেল।

এই তা হলে হরির হোটেল? লোকটি আমাকে দেখেই কেন যেন সবিনয়ে করজোড়ে নমস্কার করল। আমিও নমস্কার করে বললুম,–এটাই কি হরিবাবুর হোটেল?

সে জিভ কেটে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে স্যার, দয়া করে আমাকে বাবু বলবেন না। আমি একজন সামান্য লোক। বাইরে টাঙানো সাইনবোর্ড দেখুন! লেখা আছে অন্নপূর্ণা হোটেল। কিন্তু এ তল্লাটে সবাই বলে হরির হোটেল।

ঠিক এই সময় আমার মনে পড়ে গেল, আজ বেলা এগারোটায় খেয়েছি। তাপর ট্রেনে বার তিনেক বিস্বাদ চা। আর একই সময়ে ডাল-ভাতমাছের ঝোলমিশ্রিত লোভনীয় খাদ্যের তীব্র ঘ্রাণ আমার বাঙালি পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক করল।

সটান হোটেলে ঢুকে কাছের বেঞ্চে বসলুম। ব্যাগটা একপাশে রেখে বললুম,–আমার খুব খিদে পেয়েছে। শিগগির ব্যবস্থা করুন হরিবাবু। ডাল-ভাত যা হোক–

হরি ডাকল,–খ্যাঁদা! ও ঘেঁদু! ঘুমোলি নাকি?

ভেতর থেকে ঢোলা হাফপ্যান্ট পরা একটা নাদুসনুদুস গোলগাল গড়নের যুবক এসে একগাল হেসে বলল,–তখন তোমাকে বলেছিলুম না হরিদা, দু-মুঠো চাল বেশি করে নিই? আর তরকারি তো অনেক আছে।

হরি বলল,–তা হলে স্যারকে একখানা পুরো মিল দে!

কিছুক্ষণের মধ্যে গোগ্রাসে এক থালা ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ পরম তৃপ্তিতে খেয়ে সেঁকুর উঠল। হাতমুখ ধুয়ে এবং মুছে বললুম,–অপূর্ব! খাসা আপনার হোটেলের রান্না! খেয়ে এমন তৃপ্তি জীবনে পাইনি!

হরি বলল,–অথচ ব্যাটাচ্ছেলেরা আমার হোটেলের বদনাম রটায়! কী আর বলব স্যার? আমার নামে থানায় পুলিশের কাছে নালিশ পর্যন্ত করেছিল। যাকগে সেসব কথা। আপনি আমার অতিথি। আপনার কাছে দাম নেব না।

কিছুতেই হরি মিলের দাম নিল না। অবশেষে বললুম, ঠিক আছে। তাহলে আমাকে রাত্রে থাকার জন্য একটা ঘর ভাড়া দিন।

হরি জিভ কেটে বলল, ঘর তো নেই স্যার! আমার হোটেল শুধু খাওয়ার হোটেল। এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই। আমি আর খাদা ওপরের ঘরে রাত্তির কাটাই। নিচে কি থাকবার জো আছে? নানা উপদ্রবের চোটে অস্থির হতে হবে।

–কী উপদ্রব? হরিবাবু! আমি এই বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটাতে পারব। কোনও উপদ্রব গ্রাহ্য করব না।

হরি হাসল। আপনার মাথা খারাপ? কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমারও খিদে পেয়েছে। তা আপনি যাবেন কোথায়?

–কাঞ্চনপুর।

–দিব্যি জ্যোৎস্না-রাত্তির! মোটে তত তিন কিলোমিটার রাস্তা। হাঁটতে-হাঁটতে চলে যান। কোনও ভয় করবেন না। আমাদের এ তল্লাটে আর যা কিছু থাক, চোর ছিনতাইবাজ-ডাকাত নেই। মনের আনন্দে গান গাইতে-গাইতে চলে যান।

অগত্যা হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছি, হরি হঠাৎ ব্যস্তভাবে ডাকল, স্যার! শুনুন স্যার!

ঘুরে দাঁড়ালুম। সে আমাকে অবাক করে ছটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট আমার হাতে গুঁজে দিল। বললুম,–অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট কী হবে?

হরি মুচকি হেসে বলল,–বাইরের মানুষ! হরির হোটেলে খেয়েছেন। যদি দৈবাৎ অম্বল হয়-টয়! আপনি আমার এ রাত্তিরের একমাত্র খদ্দের স্যার! আপনি আমার সার্টিফিকেটও বটে।

বলে সে হোটেলে ফিরে গেল। আমি এতক্ষণে একটু চিন্তায় পড়লুম। খেতে তো সবই সুস্বাদু মনে হচ্ছিল। তাই খেয়েছিও প্রচুর। প্যান্টের বেল্ট ঢিলে করতে হয়েছে। কিন্তু অ্যান্টাসিড কেন?

দুধারে মাঠ। নির্জন পিচরাস্তায় গুনগুন করে সত্যিই মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে হাঁটছিলুম। জ্যোত্সায় চারদিক বেশ স্পষ্ট। কিছুদুর চলার পর মনে হল পেট বেজায় ওজনদার হয়ে উঠছে। তখন দুটো অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট মুখে পুরে চুষতে থাকলুম।

আরও কিছুদূর হাঁটার পর পেটের ওজন কমেছে মনে হল। সেইসময় নেহাত খেয়ালবশে একবার পিছু ফিরে দেখি, আমার পিছনে কেউ হেঁটে আসছে। একজন সঙ্গী পাওয়া গেল ভেবে দাঁড়িয়ে গেলুম। অমনি সেই লোকটাও দাঁড়িয়ে গেল। বললুম,–কে?

কোনও সাড়া এল না। একটু ভয় পেলুম। ছিনতাইবাজ বা ডাকাত নয় তো? চলার গতি বাড়ালুম। তারপর এক অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ করলুম। যতবার পিছনে তাকাচ্ছি, দেখছি জ্যোৎস্নায় কালো রঙের মূর্তির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশের মাঠ থেকে একজন-দুজন করে আরও নোক এসে সেই ছায়ামিছিলকে বাড়িয়ে তুলছে। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করে বললুম,–তোমরা যেই হও, আমার কাছে ডাকাতি করার মতো মালকড়ি নেই। বন্ধুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে উপহার দিতে কিছু পুতুল আর জামা কিনেছি। নগদ টাকাকড়ি যা আছে, তা তোমরা কেড়ে নিয়ে ভাগাভাগি করলে প্রত্যেকে একটা আধুলির বেশি পাবে না। কাজেই তোমরা কেটে পড়ো।

আশ্চর্য ব্যাপার, কালো কালো মানুষের দল স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তারপর আবার কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঘুরে দেখি, তারা সমান দূরত্বে আমাকে অনুসরণ করছে। এরা কারা? অজানা ত্রাসে শিউরে উঠলুম। সাহস দেখিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম, সাবধান। আমার কাছে রিভলভার আছে। আমি কিন্তু পুলিশের লোক। গুলি করে মুন্ডু উড়িয়ে দেব।

কিন্তু এই হুমকিতেও কাজ হল না। আমি যত দ্রুত হাঁটছি, তারা একই দূরত্বে নিঃশব্দে হেঁটে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালে তারাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই অদ্ভুত মায়াকালো মিছিল পিছনে নিয়ে হেঁটে চলা সহজ ছিল না। আমার গলা তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে। সঙ্গে জলের বোতল নেই। এমনকী একটা টর্চও আনিনি। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি দৌড়তে শুরু করলুম। দৌড়তে-দৌড়তে যতবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছি, সেই বিভীষিকার আমাকে অনুসরণ করছে।

কিছুক্ষণ পরে সামনে ঘন কালো গাছপালার ফাঁকে রাস্তার ধারে একটা মন্দির দেখতে পেলুম। মন্দিরের উঁচু খোলা চত্বরে কারা বসে কথা বলছিল। আমি দৌড়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতেই লোকগুলো হইচই করে উঠল। –কে? কে?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললুম,–আমি।

কেউ ধমকে বলল, আমি কে?

আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে আসছি। যাব কাঞ্চনপুর। বাস ফেল করে বড় বিপদে পড়েছি।

একজন বলল, তাই বলুন। তা বিপদটা কী?

–একদল কালোকালোলোক আমাকে ফলো করে আসছে।

–সর্বনাশ! আপনি কি হরির হোটেলে খেয়েছেন?

–খেয়েছি। বড্ড খিদে পেয়েছিল।

অমনি আবার হইচই পড়ে গেল।–ওরে! এ হরির হোটেলে খেয়েছে রে। কী সর্বনাশ! আবার একা নয়, সঙ্গে হরির হোটেলে খাওয়া পুরো দলটাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের গাঁয়ে এসেছে।

এইসব বলতে-বলতে লোকগুলো মন্দিরের পিছনে উধাও হয়ে গেল। তারপর গ্রামের কুকুরগুলো ডাকতে লাগল। আমি এবার কী করব ভাবছি, সেইসময় দেখলুম উঁচু চত্বরের পাশে একজন লোক

দাঁড়িয়ে আছে। বললুম,–দেখুন তো মশাই, কী অদ্ভুত ব্যাপার? বিপদে পড়ে এখানে ছুটে এলুম। অথচ ওঁরা অমন করে পালিয়ে গেলেন!

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল,–পালাবারই কথা। আপনি হরির হোটেলে খেয়েছেন কিনা।

করুণ স্বরে বললুম,–কেন? হরির হোটেলে খেলে কী হয়?

–যে খায়, সে ভেদবমি করে টসে যায়।

–আমি কিন্তু টেসে যাইনি। হরিবাবু আমাকে অ্যান্টাসিড দিয়েছিলেন। দুটো খেয়েছি।

–দুটোতে কাজ হয় না মশাই! এখনও আপনার পেটে হরির হোটেলের ভাত আছে তো। তারই গন্ধে যত গণ্ডগোল বেধেছে। কারা আপনাকে ফলো করেছে বলছিলেন যেন?

–হ্যাঁ। একজন-দুজন করে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ জন হবে। জ্যোৎস্নায় সব কালোকালো মূর্তি।

–তারা হরির হোটেলে খেয়ে টেসে গেছে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। হরির রান্নাটা যে সুস্বাদু! সেই লোভে পড়ে পেট পুরে খেলেই কেলেঙ্কারি। ওরা ভেদবমি করে টেঁসে গিয়েছে বটে, কিন্তু লোভটা যায়নি। আপনার পেট থেকে হরির সুস্বাদু রান্নার গন্ধ টের পেয়েই ওরা আপনার পিছু নিয়েছে। বুঝলেন তো?

–বুঝলুম। কিন্তু আপনি দয়া করে আমাকে কাঞ্চনপুরে পৌঁছে দিন।

–কাঞ্চনপুর আরও প্রায় এক কিলোমিটার। সেখানে কাদের বাড়ি যাবেন?

–নির্মল সিংহের বাড়ি।

–ও! সিঙ্গিমশাইদের বাড়ি? চলুন। আমার বাড়িও ওই গ্রামে। তবে সাবধান, আপনি আগে আগে চলুন। আমি যাব পেছনে!

–কেন? আমাকে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন?

–কিচ্ছু বলা যায় না! হরির হোটেলে এ পর্যন্ত যারা খেয়েছে তারা সবাই ফেঁসে গেছে।

–আহা! বলছি তো আমার কিছু হয়নি।

লোকটি খিকখিক করে হেসে বলল, টাটকা কেঁসে যাওয়া বডি তো! তাই প্রথম-প্রথম কিছু টের পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই তো দিব্য আমার বডিখানা আস্ত আছে! কিন্তু আত্মার ভ্রম। আসলে বডি কখন চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

–কী অদ্ভুত!

–মোটেও না। এমন হতে পারে আপনার বডির স্মৃতি আপনাকে এখনও আস্ত রেখেছে। যাক গে। চলুন। পিছনে তাকাবেন না। আমিও তাকাব না।

কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর বললুম,–দেখুন! আপনার যেমন আমাকে ভয় করছে, তেমনি আমারও আপনাকে ভয় করছে! কখন পিছন থেকে আপনি কী করে বসবেন!

–ঘাড় মটকে দেব বলতে চান?

–যা অবস্থা, তাতে এবার ওটুকুই যা বাকি।

–বাজে কথা বলবেন না! আপনি বড় অকৃতজ্ঞ মানুষ তো!

–আমাকে মানুষ বললেন যখন, তখন আর আমাকে ভয় কেন? বরং আপনার ভয় পাওয়া উচিত যারা আমাকে ফলো করে আসছিল, তাদের।

লোকটি থমকে দাঁড়াল। এই রে! একেবারে ভুলে গেছি। আমার জামার পাশপকেটে টর্চ আছে। বের করা যাক। আগে আপনাকে টর্চের আলোয় দেখে নিই। তারপর এখনও কেউ পিছনে ফলো করছে কি না দেখা যাক।

বলে সে টর্চ জ্বেলে আমাকে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে টর্চের আলো ফেলল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেই আলোয় দেখলুম, একদঙ্গল আস্ত কঙ্কাল ছিটকে দুধারে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

আর লোকটাও সেই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। আমার সৌভাগ্য, তার হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চটা ছিটকে পড়েছিল। সেটা আমি কুড়িয়ে নির্ভয়ে এবার নিয়ে হেঁটে চললুম।

মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে টর্চের আলো ফেলছিলুম। কিন্তু আর কেউ আমাকে অনুসরণ করছিল না। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর রাস্তার বাঁকের মুখে মোটরসাইকেলের উজ্জ্বল আলো দেখা গেল। তারপর মোটর সাইকেলটা আমার কাছে এসে থেমে গেল। নির্মলের সাড়া পেলুম। যা ভেবেছিলুম! এতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ তো শনিবার। পুঁটু কি অত ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে পারবে? হা রে! হেঁটে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো? আয়! ব্যাকসিটে বোস! দোষটা আমারই। বুঝলি?

মোটরসাইকেলের ব্যাকসিটে চুপচাপ উঠে বসলুম। যা ধকল গেছে, এখন আর কোনও কথা নয়।

না। পরেও আর কোনও কথা নয়। এমনকী হরির হোটেলে খাওয়ার কথাও চেপে যাব। হরির দেওয়া অ্যান্টাসিডের ট্যাবলেট দেখিয়ে বলব,–রাতে কিছু খাব না! পেটের অবস্থা ভালো না।

তাছাড়া আমি হরির হটেলে খেয়ে এসেছি শুনলে নির্মল নির্ঘাত আমাকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করবে। তার মানে, মোটরসাইকেলের অ্যাকসিডেন্ট এবং আমি নিজেই ভূত হয়ে যাব। সর্বনাশ!

শুধু একটাই ভাবনা, হরির হোটেলের ভাত যতক্ষণ না পুরো হজম হচ্ছে, ততক্ষণ কি নির্মলের বাড়ির আনাচে-কানাচে সেই ছায়াকালো কালো মিছিলের মূর্তিগুলো গন্ধ শুঁকতে ঘুরঘুর করে বেড়াবে? দেখা যাক।...

Finish